Bangladesh Journal of Political Economy

© 2010 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 26, No. 2, December 2010, pp. 01-34
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

"রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলন

আবুল বারকাত [১]

১. বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে "গণমুখী সমবায় আন্দোলন"–"রূপকল্প ২০২১" এর যোগসূত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshophy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহাসিক বিশ্বাস যে "কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে" (only people can make history)। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন দর্শন, যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭(১)]।

বঙ্গবন্ধুর গভীর মানবিক সংগ্রামী এ দর্শনের প্রতিফলনই হল তার স্বপ্ন: "সোনার বাংলার স্বপ্ন", "দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন", "শোষণ-বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশ-এর স্বপ্ন"। এ স্বপ্ন প্রতিফলিত হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যেখানে স্বপ্ন ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের জন্য কমপক্ষে ২টি বিষয় নিশ্চিত করা:

১. মানুষে-মানুষে বৈষম্য দূর
২. অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ।

অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন অনুযায়ী কথাছিলো স্বাধীন বাংলাদেশ হবে 'সুস্থ-সবল-জ্ঞান সমৃদ্ধ-ভেদহীন মানুষের দেশ"। কিন্তু, ১৯৭৫ সালে পরিবার-পরিজনসহ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালী জাতির এ স্বপ্ন হত্যা করা হলো।

---

১ অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল (ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, hdrc@bangla.net)

"বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রবন্ধকার কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তর আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০০৯ উদযাপন উপলক্ষে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয়েছিলো (০৭ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে)। উত্থাপিত প্রবন্ধটি উপরোল্লিখিত প্রবন্ধের পরিমার্জিত রূপ।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিলো ঐ স্বপ্ন বিনির্মাণে **সমবায়ের** অন্তর্নিহিত শক্তি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করা। আর সে কারণেই **মালিকানার নীতি** বিষয়ে সংবিধানের **১৩**নং অনুচ্ছেদে বলা হলো গুরুত্বক্রম অনুসারে রাষ্ট্রে মালিকানা ব্যবস্থা হবে প্রথমত **রাষ্ট্রিয় মালিকানা,** দ্বিতীয়ত **সমবায়ী মালিকানা,** তৃতীয়ত **ব্যক্তিগত মালিকানা**। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারি চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় **১৯৭২** সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। গুরুত্বের কারণে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যটি হুবহু উদ্ধৃত করছি:

> "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে **গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে** অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ– সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরীব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক,শ্রমিক, তাঁতী, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতী মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল– ভোগের ন্যায্য অধিকার।
>
> কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমুল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভূঁয়া সমবায় কোন মতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন– কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতী সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতী, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলিকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারী স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেবো।

> আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নূতন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে। .....
>
> জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা"।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় আন্দোলন কেন্দ্রিক যে মানবিক উন্নয়ন দর্শনের কথা বললাম তারই ধারাবাহিকতায় যুক্তিযুক্তভাবেই বিনির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহারে নির্দেশিত 'ভিশন ২০২১' বা 'রূপকল্প ২০২১'। 'রূপকল্প ২০২১' এর মুল কথা হলো স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির সময় অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র"। আর এ কল্যাণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত "গণমুখী সমবায় আন্দোলন" এর বিকল্প নেই।

২. সমবায়ের গুরুত্বঃ বিশ্ব পরিস্থিতি

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারী-বেসরকারী খাতের পাশাপাশি সমবায় পদ্ধতির ব্যবহার সারা বিশ্বেই স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অতি জনপ্রিয়। ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ এলায়েন্স (ICA)-র তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ সমবায়ের সদস্য। বিশ্বে সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থানপ্রাপ্ত হয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা এখন ১০ কোটি। ৩০০ কোটি মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে সমবায়ের মাধ্যমে। সারা বিশ্বের ২৫% বীমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয় সমবায়ের মাধ্যমে এবং বিশ্বের ৩৩% দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ করে সমবায়। বিশ্বের ৩০০ টি বৃহৎ সমবায় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ ৩০,০০,০০০-৪০,০০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং বার্ষিক টার্নওভার (বিক্রয়) এর পরিমাণ ৯৬,৩০০ কোটি ডলার যা বিশ্বের নবম বৃহত্তম অর্থনীতি অর্থাৎ কানাডার অর্থনীতির সমান। অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় যে গুরুত্বপূর্ণ তা বিভিন্ন দেশের সমবায় কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে সমবায়ের গুরুত্ব নিয়ে কিছু তথ্য দেয়া যাক:

- নরওয়ের ৯৯% ডেইরী পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। ভোগ্যপণ্য বাজারের ২৫% সমবায়ের দখলে এবং প্রতি ৩ জন নরওয়েবাসীর মধ্যে ১ জন সমবায়ী।
- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় মোট উৎপাদনের ২২% আসে সমবায় খাত থেকে। ৯৫% ডেইরী সামগ্রী সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় এবং ডেইরী পণ্য রপ্তানীর ৯৫% আসে সমবায় খাত থেকে। এছাড়া ৭০% মাংস, ৫০% কৃষিজ সামগ্রী, ৭০% সার বিপণন, ৭৫% পাইকারী ঔষধ, ৬২% মুদী ব্যবসা সমবায়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।
- সিংগাপুরের ভোগ্য পণ্য সমবায়গুলো মোট বাজারের ৫৫% নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যাদের বাৎসরিক টার্নওভার ৭০ কোটি ডলার।
- ফ্রান্সে প্রতি ১০ জন কৃষকের ৯ জনই সমবায়ী। মোট আমানতের ৬০% সমবায় ব্যাংকে সংরক্ষিত এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের ২৫% সমবায়ী।
- জাপানে ৯১% কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য। কৃষি সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য প্রায় ৯

কোটি ডলার।

- কোরিয়ার ৯০% কৃষক সমবায়ী এবং সমবায়ী কৃষকের সংখ্যা ২০ লাখের বেশী। তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য ১ কোটি ডলার। তাছাড়া মোট মৎস্য উৎপাদনের ৭১% সমবায়ী মৎস্যজীবীরা উৎপাদন করে থাকেন।
- ভিয়েতনামের মোট জিডিপি'র ৮.৬% আসে সমবায় খাত থেকে।
- কুয়েতের খুচরা বাজারের ৮০% সমবায়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে সমবায়ঃ সংক্ষেপিত ইতিহাস

এদেশের সমবায়ের ইতিহাস আসলে ৫০০ বছর হবে। তবে, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় গঠনের বয়স ১০০ বছরের বেশি। একটি পদ্ধতি এ সুদীর্ঘকাল টিকে থাকার মধ্য দিয়েই এর গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা প্রমাণ হয়। যদিও সরকারী ও ব্যক্তিখাতের তুলনায় সমবায় খাতের ব্যবহার আমাদের দেশে এখনো সীমিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপরিকল্পিত, তথাপি এ দীর্ঘযাত্রায় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অনেক কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের গৌরবোজ্জ্বল অভিজ্ঞতা রয়েছে সমবায় অধিদপ্তরের।

দারিদ্র পীড়িত, নিরক্ষর এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। এ লক্ষ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয় এবং সম্প্রসারণ কর্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং প্রয়োজনে রাত্রি যাপন করে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে প্রথম সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাভাবিক উন্নয়ন সুবিধা বঞ্চিত সংখ্যালঘু অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাছাড়া মানব উন্নয়ন ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সমবায়ের অবদান যথেষ্ট। দেশের সর্বস্তরে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় সমবায়ের মতো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের জন্য এক বিরাট ও মহৎ অভিজ্ঞতা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইন মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, নির্বাচন ও সভা অনুষ্ঠান, হিসাব রক্ষণ, অডিট মোকাবিলা সহ আর্থিক কর্মকা- পরিচালনার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমবায়ের সদস্যদের যে নেতৃত্ব, দায়িত্বশীলতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে তা ঐ সকল সদস্যদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী দায়িত্বশীল করে তুলে। আজকে দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় মানুষের মধ্যেই এর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

৪. বাংলাদেশে সমবায়ঃ উন্নয়ন সম্ভাবনার নবদিগন্ত উন্মোচনে সক্ষম

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার নিরিখে বলা যায় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও রূপকল্প ২০২১ (ভিশন ২০২১) বাস্তবায়নে বিশেষ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, নারী সহ মানব সম্পদের উন্নয়ন ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তনে সমবায়

পদ্ধতি (অধিদপ্তরসহ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য: কেন বাড়ে? সমবায় কি করতে পারে?

নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এমন এক অবস্থা যা অনেক অর্থনীতিতেই কম বেশী ঘটে থাকে । তবে ভোক্তার স্বার্থ বিবেচনায় বিচার করা হলে এর প্রভাব দেশ ভেদে এক নয় । যেক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোক্তাদের আয়ও বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত ক্রয় ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকে অথবা বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মূল্যবৃদ্ধি তেমন কোন সমস্যা নাও হতে পারে । কিন্তু যেসব অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না সেক্ষেত্রে ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলে ভোক্তার ব্যয় সীমিতকরণ ব্যতীত কোন উপায় থাকে না । আর ব্যয় সংকোচন মানেই ভোক্তার জীবন মানের অবনতি যা আদৌ কাম্য অবস্থা নয় ।

বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতির যেসকল কারণ পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. সাপ্লাই চেইনে প্রতিবন্ধকতা: প্রায় সকলেই একমত যে বাংলাদেশে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ চেইনে বহু ধরনের প্রচুর প্রতিবন্ধকতা আছে যা উৎপাদক ও খুচরা বিক্রেতার পর্যায়ে দামের মধ্যে বিরাট পার্থক্যের কারণ । এ লাইনে আছে মধ্যস্বত্বভোগী এবং দালাল; আছে ক্ষেত্র বিশেষে চাঁদাবাজি; অনুন্নত অবকাঠামো ও অপ্রতুল পরিবহন সুবিধার জন্যও বৃদ্ধি পায় পরিবহন খরচ; পচনশীল পণ্যের বিক্রেতারা নষ্ট পণ্যের ক্ষতি পোষানোর জন্যও দাম বাড়িয়ে থাকে ।

২. উৎপাদন হ্রাস, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও টাকার অবমূল্যায়ন: বেশকিছু অর্থনৈতিক কারণ যেমন যোগানের তুলনায় অতিরিক্ত চাহিদা (demand pull), উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি (cost push) এবং টাকার অবমূল্যায়ন দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয় । আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য বৃদ্ধিসহ পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত পণ্যসামগ্রী এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য । যেহেতু আমাদের খাদ্য আমদানী করতে হয় এবং দরিদ্র-নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ ভোক্তাদের ব্যয় তালিকায় খাদ্য ব্যয় প্রায় ৬০%, সেহেতু এর প্রভাব স্থানীয় বাজারে অনেক বেশী ।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি/মানি ইনকাম বৃদ্ধি: কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি পাশাপাশি চলে । ধরেই নেয়া হয় যে প্রবৃদ্ধি হলে দ্রব্যমূল্য বাড়বে ।

৪. মূল্যবৃদ্ধির আশংকা: মূল্যবৃদ্ধির আশংকাও অনেক সময় মূল্যবৃদ্ধির কারণ ঘটায় । বিশেষ করে মিডিয়ার "বদৌলতে" এ ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে ।

৫. মুনাফাখোর ও অসাধু ব্যবসায়ীদের অপতৎপরতা: অনেক সময় পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে । মজুদদারী ও কার্টেল ব্যবস্থা এর সাথে যুক্ত হয় । সেইসাথে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সিন্ডিকেটইজম তো আছেই ।

আমার মতে, ক্রমবর্ধমান মূল্য পরিস্থিতি থেকে পরিত্রান পাওয়ার ক্ষেত্রে সমবায় শক্তিশালী ভূমিকা পালনে সক্ষম । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, সাংবাদিক প্রায় সবাই জোর দিচ্ছেন উৎপাদন, বণ্টন ও ভোক্তা পর্যায়ে সমবায় সমিতি গঠনের উপর । উৎপাদন

বণ্টন ব্যবস্থায় সমবায়ের গুরুত্ব মূলতঃ বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা (unfair practice) এবং সমবায়ের উৎকর্ষতা (fair trade)-র দিক থেকে দেখা সম্ভব। উৎপাদন পর্যায়ে সমবায় সমিতি গঠন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকিকরণে সাহায্য করে। ফলে উৎপাদনকারীদেরকে লক্ষ্য করে সরকারী সেবা প্রদান (support service) ফলপ্রসূ ও সহজ হয় যা কম খরচে উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। অন্যদিকে সংগঠিত উৎপাদনকারীগণ পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করতে পারে যা দালাল/মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা কমিয়ে অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে এবং কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতেও সহায়তা করে। ফলে ভোক্তা এবং উৎপাদনকারী উভয়ের জন্যই win-win situation সৃষ্টি সম্ভব।

উল্লিখিত যুক্তির নিরিখে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে একশত বৎসরের অধিক সময় ধরে সমবায় সমিতি সংগঠিত হয়ে আসছে এবং বর্তমানে দেশে বিভিন্ন স্তরে প্রায় দেড় লক্ষ সমবায় সমিতি রয়েছে, যার সাথে প্রায় ৪(চার) কোটি মানুষ জড়িত। যদিও বিদ্যমান সকল সমবায় সমিতিরই কার্যক্রম প্রত্যাশিত মানের নয়, তথাপি একটি ব্যবস্থা একশত বৎসর টিকে থাকার মধ্য দিয়েই তার উপযুক্ততা যথেষ্ট মাত্রায় প্রমাণিত হয়। তবে অতীতে বিশেষ করে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ দশকের মধ্যে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সমবায়ের পরিকল্পনায় হলেও বর্তমানে একমাত্র দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যব্যতীত উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে সমবায়ের পরিকল্পিত ও সংগঠিত কার্যক্রম নেই বললেই চলে। দেশের মোট সমবায় সমিতির প্রায় অর্ধেক হ'ল কৃষি সমবায় সমিতি যেগুলো পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফের ঘোষণা কার্যকর না হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৯০ এর দশক থেকে প্রায় অকার্যকর ও মৃতপ্রায়। শহর অঞ্চলে সমবায়ের কিছু বিস্তৃতি ঘটলেও এদের অধিকাংশই আর্থিক সেবা প্রদানে নিয়োজিত। এমনকি খোদ সমবায় অধিদপ্তরের অবস্থানও এ লক্ষ্য থেকে বহু বহু দূরে। প্রকৃত সত্য হল এই যে, সমবায় আইনের আলোকে বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করা ছাড়া অন্য কোনরূপ পেশাদারিত্ব অর্জনের সুযোগ এবং সংস্কৃতি সমবায় অধিদপ্তরে প্রায় অনুপস্থিত। এহেন প্রেক্ষাপটে সমবায়ের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে সফলতা অর্জন করতে হলে অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি যা বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-দপ্তরসমূহের যোগসূত্র স্থাপন করা অপরিহার্য। সেসব পদক্ষেপের অন্যতম নিম্নরূপ:

১. জনসংখ্যা, এলাকাভেদে খাদ্যাভাস এবং আপতকালীন অবস্থা মোকাবেলায় কি পরিমাণ খাদ্যশস্য, শাক-সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের চাহিদা হতে পারে তা নিরূপণ করা ;

২. ভূমির উপযুক্ততা, উৎপাদনশীলতা, পর্যাপ্ততা ও উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনায় চাহিত পণ্যের বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য এলাকা নির্ধারণ করা। এ দায়িত্বসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পালন করতে পারে ;

৩. পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারিত এলাকায় উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সংহতকরণ ;

৪. গঠিত সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কীটনাশকসহ কৃষি ঋণ ও সেচ সুবিধা সরবরাহ করে কম খরচে অধিক উৎপাদনে সহায়তা করা। উল্লেখ্য যে, সংস্কারের নামে আজ কৃষি উৎপাদনের প্রায় সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত প্রায়।

কাজেই এ সকল প্রতিষ্ঠান যেমন- বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ইত্যাদির কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন;

৫. সমবায় পাইকারী বাজার প্রতিষ্ঠা করে এর সাথে উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলোর ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করা;

৬. পাইকারী বাজার থেকে পণ্য সামগ্রী বিশেষ ব্যবস্থায় (মিল্ক ভিটা এর অনুসরণে) ভোক্তা সমবায় সমিতিতে পৌঁছানো ও বিক্রির ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য যে, দ্রব্য মূল্য বেশী বৃদ্ধি পায় খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে। কাওরান বাজারে পাইকারী বিক্রেতা কর্তৃক ৮ টাকা দরে বিক্রিত সবজি কাওরান বাজারেই খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক ২৫ থেকে ২৮ টাকা দরে বিক্রি করতে দেখা যায়। মূলতঃ পাইকারী বাজারে সঠিক ওজন না দেয়া, পচা-গলা পণ্যের মিশ্রণ, পরিবহনের অসুবিধা, অতিরিক্ত টোল আদায়, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শ্রম ব্যয়, অসংগঠিত/অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজার ব্যবস্থা এবং খুচরা পর্যায়ে বেশি মুনাফা আদায়ের মানসিকতার কারনেই এ ধরণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে থাকে। কাজেই পচনশীল পণ্য সামগ্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত যানবাহন ব্যবহারসহ পাইকারী বাজার থেকে খুচরা বিক্রেতার পর্যায়ে আদর্শ ও দক্ষ অনুশীলন (fair practice) নিশ্চিতকরণের মধ্যেই সুপারিশকৃত প্রচেষ্টার সফলতা অনেকাংশ নির্ভর করে ;

৭. ভোক্তা সমবায় সমিতির পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধ সুপার মার্কেট এবং চেইন শপের মাধ্যমেও এসব পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করা যেতে পারে যদি ঐ বাজারে ফেয়ার ট্রেড অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকে ;

৮. আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের বেশ বড় অংশ আমদানী নির্ভর। ব্যক্তি খাতের হাতেগোনা কয়েকজন অলিগোপলিষ্ট এর মাধ্যমে এ আমদানি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে যাদের সততা ও নৈতিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। এক্ষেত্রে সিন্ডিকেট-ইজম তো আছেই। কাজেই সমবায়ের পাইপ লাইনে আমদানিকৃত পণ্য বাজারজাতকরণ করতে হলে টিসিবি'র মাধ্যমে আমদানি বাড়াতে হবে এবং ব্যক্তি খাতে আমদানিকৃত পণ্যও সমবায়ের মাধ্যমে যাতে বাজারজাত করা যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে ;

৯. সমবায়ের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে সমবায় অধিদপ্তর বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এ দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করতে হলে সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; এবং

১০. সর্বোপরি, সার্বিক বিষয়ে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের সিদ্ধান্ত ও সমর্থন একান্ত প্রয়োজন যা জাতীয় সমবায় নীতিমালার চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

সমবায়ঃ কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম

আসলে কৃষিকে কেন্দ্র করেই এদেশে সমবায়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু। দারিদ্র পীড়িত, নিরক্ষর এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। এ লক্ষ্যে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা হয় এবং সম্প্রসারণ কর্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং প্রয়োজনে রাত্রি যাপন করে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৮০'র

দশকের মাঝামাঝি এদেশে প্রথম সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ৬৯,০০০। কিন্তু ১৯৯১ সালে সরকার ঘোষিত ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফের ঘোষণা সমবায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে সৃষ্ট জটিলতা এবং বেসরকারীকরণ নীতির কারণে সরকারী সমর্থন হ্রাস, দ্রুততার সাথে সমিতি সংগঠনের ফলে বিআরডিবি সমিতি সমূহের সাংগঠনিক দূর্বলতা এবং মূল কর্মসূচী বাদ দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বিআরডিবির অধিক মনোযোগী হওয়া– ইত্যাদি কারণে কৃষি সমবায় সমিতিগুলো এখন প্রায় নিষ্ক্রিয় ও মৃতপ্রায়। এ অবস্থা পাল্টাতে হবে।

জাতীয় পানি নীতিমালার বিধান মতে দেশে ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে এলজিইডি ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সৃষ্ট পানি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে **পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি**। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ১,৭০০। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, মৎস্য চাষ ও ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনাকারী এ সকল সমিতি সংগঠনে আইনগত সমর্থন এবং নিবন্ধন পরবর্তী যাবতীয় বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনসহ প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদান করছে সমবায় অধিদপ্তর।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ঃ সম্ভাবনা অনেক তবে বাস্তবরূপ নিচ্ছে না

দেশের পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে এরূপ সমিতির সংখ্যা প্রায় ৩,৩৪০টি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সরকারী উন্মুক্ত জলাশয় এ সকল সমিতির নামে ইজারা দেয়ার মাধ্যমে এদের জীবিকা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার আওতায় কার্যকরী মূলধনসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, অমৎস্যজীবীদের (জলদস্যু) অনুপ্রবেশ, জলাভূমি হ্রাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল সমিতির সদস্যগণ প্রত্যাশিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সমিতিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে।

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি : সফলতা অনেক, তবে আরো করার আছে

দুগ্ধ উৎপাদনে সফলতা অর্জনকারী বিশ্বের প্রায় সকল দেশের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঐ সফলতার পেছনে রয়েছে সে দেশের সমবায়ের অবদান। বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ ভারতের প্রায় ৮০% দুধ সে দেশের দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতিগুলো উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশে এ খাতে সমবায়ের অবদান প্রত্যাশিত মানের না হলেও সমীহযোগ্য বটে। অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে আধুনিক ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন, গাভীর জাত উন্নয়ন এবং সংগৃহীত দুধ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে শহরাঞ্চলের ভোক্তাদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ও মিল্ক ভিটার সৃষ্টি সমবায় অধিদপ্তরের একটি সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১,৭০০ এবং ফেডারেশনের সংখ্যা মাত্র একটি যা মিল্ক ভিটা নামে পরিচিত। মিল্ক ভিটার মাধ্যমে বাৎসরিক দুগ্ধ সংগ্রহের পরিমাণ প্রায়

৮.৫ কোটি লিটার এবং বাৎসরিক লেনদেন প্রায় ২,৪০০ কোটি টাকা। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রায় ১০(দশ) লক্ষ এবং মিল্ক ভিটায় কমরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। বর্তমানে বাজারজাতকরণকৃত মোট পাস্তরিত তরল দুধের প্রায় ৫০% মিল্ক ভিটা কর্তৃক সরবরাহকৃত।

আশ্রায়ণ ও আবাসন সমবায় সমিতি : ভাল উদ্যোগ; আরো বিস্তৃতি প্রয়োজন

বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের জন্য বাসস্থান এবং প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ, যাতায়াত ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত একটি অনন্য প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৭৭০টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন করে ৫৫,৫৫৬ টি পরিবারের ৯৭,০১৭ জন সদস্যকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে এবং এদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রায় ৩৮,৮৬,৩৮,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর এ প্রকল্পের আওতায় সমবায় সমিতি সংগঠন, প্রশিক্ষণ, আইনগত সমর্থন এবং ঋণ প্রদান ও আদায়ের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। আশ্রয়হীন মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার নিরিখে বলা উচিত যে, আশ্রায়ন ও আবাসন সমবায় সমিতি-র আরো দ্রুতগতিতে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী সমবায় সমিতি : গতি বাড়ানো দরকার

ক্ষুদ্র ঋণের আবিষ্কর্তা কিন্তু এ দেশের সরকারী উদ্যোগ। ক্ষুদ্র ঋণের আবিষ্কারক ও ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে আমাদের খ্যাতি এখন বিশ্বজোড়া। এ ক্ষেত্রে বড় বড় এনজিওগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিআরডিবি কর্তৃক সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া স্ব-উদ্যোগী সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে অসামান্য প্রশংসার দাবী রাখে, কেননা এ সকল সমিতির তহবিল নিজস্ব সঞ্চয় থেকে সৃষ্ট এবং অর্জিত মুনাফা সদস্যগণই লভ্যাংশ আকারে পেয়ে থাকেন। নিজস্ব মূলধন হওয়ার কারণে এ সকল সমিতির কার্যক্রম স্থায়িত্বের দিক থেকে (sustainability point of view) এনজিওদের তুলনায় অনেক বেশী সম্ভাবনাময়।

সমবায়ের সম্ভাবনা নির্দেশক কয়েকটি তথ্য সারণি ১-এ দেখানো হল। কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৪১০টি সমবায় সমিতি ১,৮০,৫৮৩ জন সদস্যকে সেবা প্রদান করছে যার আওতায় সৃষ্ট শেয়ারের পরিমাণ মোট ৬৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৬০ হাজার

সারণি ১: বাংলাদেশে সমবায় সংক্রান্ত কিছু তথ্য

নির্দেশক	২০০৮ (৩০ জুন)
সমবায় (মোট সংখ্যা)	৪১০
মোট সদস্য	১,৮০,৫৮৩
মোট পরিসম্পদ (কোটি টাকা)	২৮২.২
মোট সঞ্চয় (কোটি টাকা)	১৬০.৫
মোট শেয়ার (কোটি টাকা)	৬৭.৩
মোট বিতরণকৃত ঋণ (কোটি টাকা)	১৯২.৮
মোট রিজার্ভ (কোটি টাকা)	৩৭.২

উৎস: Cooperative Credit Union League of Bangladesh Ltd (CCULB), 2008.

টাকা, সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৬০ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, সম্পদের পরিমাণ ২৮২ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯২ কোটি ৮৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৩৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। কোনরূপ সরকারী আর্থিক সহায়তা ব্যতীত সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় পরিচালিত এ সকল সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

বহুমূখী সমবায় সমিতি : নতুন প্রজন্মের স্ব-উদ্যোগী সমবায়

সরকারের বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণ নীতি, আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ও এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতা বহির্ভূত মধ্যবর্তী শ্রেণী ও ক্রমবর্ধমান নগরায়ন-এর প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সুযোগ গ্রহণের জন্য স্থানীয় উদ্যোগে সংগঠিত নতুন প্রজন্মের বহুমূখী সমবায় সমিতির আবির্ভাব শুরু হয় মূলত: ১৯৯০ এর দশকে। এ ধরনের সমবায়ের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। মার্কেটিং, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন ও হাউজিং সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সেবামূলক কর্মকা- পরিচালনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি সহ বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ সকল সমিতি বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখছে।

তবে এ শ্রেণীভূক্ত সমবায় সমিতির কার্যক্রম এখনো প্রত্যাশিত মানের নয়। সততা, পেশাগত দক্ষতা ও সঠিক নেতৃত্বের অভাব এবং সমবায় অধিদপ্তরের উপযুক্ত মনিটরিং এর অভাবে এ ধরনের বেশ কয়েকটি সমিতি ইতিমধ্যে অচলাবস্থায় আছে এবং আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ প্রদানে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কাজেই যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যবস্থার মধ্যে যদি এ সকল সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত না করা যায় তবে একসময় এগুলি চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে; নিঃস্ব হয়ে যেতে পারেন এ সব সমবায়ের সদস্যরা।

কতিপয় সম্পদশালী অকার্যকর সমিতি: কিছু ভাবনা-দুর্ভাবনা

১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর দশকে তৎকালিন সরকারসমূহের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশীদার কতিপয় শ্রেণীর প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় সমবায় সমিতি যেমন ইউনিয়ন বহুমূখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বহুমূখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় শিল্প ইউনিয়ন, জাতীয় শিল্প সংস্থা, জাতীয় শিল্প সমিতি, সমবায় জুট মিল ও কটন মিল এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ইত্যাদি সমিতিগুলো সময়োপযোগীতা হারিয়ে বর্তমানে অকার্যকর অবস্থায় আছে। সমবায় অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায় যে, বর্তমানে এরূপ সমিতির সংখ্যা প্রায় ৫,০০০। এর মধ্যে ৮১৬টি সমিতির মালিকানায় রয়েছে প্রায় ৪১,৭৯২.৯৭ শতাংশ জমি যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকা। এছাড়া প্রায় ২০০ কোটি টাকা মূল্যের দালানকোঠা, প্ল্যান্ট, মেশিনারীজ ও অন্যান্য সম্পদ রয়েছে। এ সকল সমিতির প্রকৃত কোন সুবিধাভোগী না থাকার কারনে একশ্রেণীর অসৎ, সুবিধাবাদী, মতলববাজ ঐ সকল সমিতির কর্মচারী ও কিছু অসৎ সমবায় কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় এ সম্পদ ভোগ করছে এবং বিভিন্ন কৌশলে স্থায়ীভাবে জবরদখল নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

সমবায়: সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সক্ষম

বাংলাদেশে সমবায়ের অবদান শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধা সৃষ্টির মাপকাঠিতে বিচার করা যথার্থ হবে না। কেননা সামাজিক পরিবর্তনে এর বিরাট অবদান রয়েছে। নিরক্ষর ও অনভিজ্ঞ কৃষকদেরকে আধুনিক

প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, দুগ্ধ খাতে আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন, সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য।

তাছাড়া দেশের সর্বস্তরে বিশেষ করে পল্লী এলাকায় সমবায়ের মতো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের জন্য মহৎ অভিজ্ঞতা বিস্তারের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আইন মোতাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা, নির্বাচন ও সভা অনুষ্ঠান, হিসাব রক্ষণ, অডিট মোকাবিলা সহ আর্থিক কর্মকা- পরিচালনার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমবায়ের সদস্যদের যে নেতৃত্ব, দায়িত্বশীলতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে তা ঐ সকল সদস্যদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশী দায়িত্বশীল করে তোলে। এ অধিকারবোধ ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক খাতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

৫. সমবায় অধিদপ্তরঃ চলমান কর্মকাণ্ড, সীমাবদ্ধতা ও গতি বৃদ্ধিতে করণীয়

দেশের ব্যাপক দুগ্ধ ঘাটতি ও বেকারত্ব দূরীকরণে বাংলাদেশ সমবায় অধিদপ্তর বাৎসরিক প্রায় ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ লিটার দুগ্ধ উৎপাদনক্ষম একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করেছে যা এখন অনুমোদনের অপেক্ষায়। প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে দু'টি উন্নয়ন প্রকল্প। জেডিসিএফ এর অর্থায়নে ৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৯-২০১১ মেয়াদে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এর আওতায় ২৪০০ অতি দরিদ্র গারো পরিবারে জীবনমান উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর সমবায়ী মৃৎশিল্পীদের জীবনমান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুমিল্লার বিজয়পুরে বাস্তবায়িত হচ্ছে "বাংলাদেশের সমবায় মৃৎশিল্পের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। এছাড়া, সমবায় অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৪টি কম্পিউটার ল্যাবে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পাশাপাশি সমবায়ীগণকেও কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যা বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এদেশে সমবায়ের প্রশাসন, কার্যক্রম এবং উন্নয়নের জন্য সমবায় অধিদপ্তর মূল সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর দেশ জুড়ে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে ঐতিহাসিকভাবে যে ভূমিকা রেখেছে তা সর্বমহলেই স্বীকৃত। পাশাপাশি প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার দায়ভারও সমবায় অধিদপ্তরের রয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের দায়িত্ব সমূহকে মূলত: তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা ঃ বিধিবদ্ধ দায়িত্ব (regulatory), উন্নয়নমূলক দায়িত্ব (developmental), এবং সম্প্রসারণমূলক দায়িত্ব (promotional)। সমবায় অধিদপ্তরের এসব দায়িত্ব পালনে সাধারণতঃ যে সকল **সীমাবদ্ধতা** চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি।
- সমবায় কর্মকর্তাগণের পেশাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত উৎকর্ষতা আনয়নের জন্য প্রশিক্ষণের অভাব।
- অপ্রতুল logistic support।

- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদোন্নতির সীমিত সুযোগ।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বদলী ও পোষ্টিং সংক্রান্ত নীতিমালার অনুশীলন না হওয়া।
- কর্মমূল্যায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থার অনুশীলন না হওয়া।
- রাজনৈতিক চাপ মোকাবেলায় ও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কর্মকর্তাদের অক্ষমতা।
- সমবায় সমিতি নিবন্ধনের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা ও আন্তরিকতার অভাব।
- অভিযোগ তদন্ত, বিবাদ নিষ্পত্তি ও সমিতি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন না করা।
- সমবায় সমিতির অডিট পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র অডিট ইউনিটের অনুপস্থিতি।
- বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অকার্যকর ও সম্ভাবনাহীন সমবায় সমিতিগুলোকে দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে না পারা।
- সমবায়ীদের জন্য সময়োপযোগী পেশাভিত্তিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদানে উদ্যোগের অভাব।
- সমবায় ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা না থাকা এবং ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনয়নের জন্য বিতরণ ও আদায় পদ্ধতির সংস্কারে ব্যর্থতা।

উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাসমূহ দূরীকরণে এবং সেইসাথে সমবায় অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ ও সমবায় আন্দোলন সক্রিয় করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। **করণীয়সমূহ** হতে পারে নিম্নরূপ:

- সমবায়ের সপক্ষে প্রচারণা বৃদ্ধি: সমবায়ের গুরুত্ব, উপযোগীতা ও অবদান তুলে ধরে এর সপক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের প্রচার ও প্রকাশনা শাখার কার্যক্রম জোরদারকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।
- সমিতির সংখ্যা হ্রাস ও যৌক্তিককরণ: বিদ্যমান ১ লক্ষ ৬২ হাজার সমিতির মধ্যে প্রায় ৯৩,০০০ সমিতি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সংগঠিত। বর্তমানে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করায় এ সকল সমবায় সমিতিগুলোর কার্যক্রমে স্থবিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সমবায় অধিদপ্তরকে বিধিবদ্ধ দায়িত্বের অংশ হিসেবে প্রতিবৎসর এ সকল সমিতির অডিট সম্পাদন করতে হয়। ফলে যথেষ্ট জনবল এবং আর্থিক সংশ্লিষ্টতাসহ বিনা কারণে ব্যর্থতার দায়ভার বহন করতে হয়। কাজেই বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট এ সকল সমিতির দায়িত্ব বিআরডিবি বরাবরে হস্তান্তর করা হলে এবং অন্যান্য অকার্যকর সমবায় সমিতি বাতিলের মাধ্যমে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা যদি ৪০ হাজারে নামিয়ে আনা যায় তবে অতি সহজেই এদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়ন সম্ভব হবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ভবিষ্যতে সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে না।
- কৃষি খাতে সমবায়ের কার্যক্রম জোরদারকরণ: বিদ্যমান বাস্তবতা ও তুলনামূলক সুবিধার বিবেচনায় সমবায় সংগঠনের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও Vertical Integration এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে সমবায়ের ভূমিকা জোরদার করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের প্রধান প্রধান চাল, সবজি ও মাছমাংস উৎপাদনকারী এলাকায় উৎপাদনকারীকে সংগঠিত করে সমিতি গঠন এবং সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় পরিবহনের মাধ্যমে বাজারজাতকারী সমবায় সমিতিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ সমবায়ী কৃষকদের ক্ষেত্রে কার্যকর করে এসকল সমিতিগুলোকে পূর্ণ

কার্যকর করার জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

- দুগ্ধ খাতে সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্প্রসারণ: বাংলাদেশে সমবায়ের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও সফল খাত হলো দুগ্ধ খাত। বিভিন্ন অনাকাঙ্খিত কারণে আর্থিক ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি দিন দিন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পেশাদারিত্ব আনয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম যৌক্তিক করণের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক ও প্রত্যাশিত সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের উপ-আইন ও নিয়োগ বিধি সংশোধন করা প্রয়োজন।
- নতুন প্রজন্মের ক্রেডিট ও বহুমূখী সমবায় সমিতিগুলোর জন্য উপযুক্ত আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: সরকারের বেসরকারীকরণ কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে বিশেষ করে মেট্রোপলিটান শহরগুলোতে ক্রেডিট সমবায় সমিতির সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে। আইনের দূর্বলতা ও যথাযথ তদারকির অভাবে এ সকল সমবায় সমিতি কর্তৃক আমানতকারীদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারণার ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। এ সকল সমবায় সমিতির জন্য আইনের সংশোধন, নিবন্ধনে সতর্কতা অবলম্বন ও যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- সমবায়ের সাথে আরো অধিক সংখ্যক নারীর সম্পৃক্তকরণ: বর্তমানে মোট সমবায় সমিতির মধ্যে মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা মাত্র ১৫%এবং নারী সমবায়ীর সংখ্যা ১৮%। বাংলাদেশে মহিলাদের বর্তমান অবস্থান বিবেচনায় সরকারের উন্নয়ন অংগীকার ও বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকা- নারীদের অধিকতর সততা ও দক্ষতা বিবেচনা করে সমবায়ের উন্নয়নে অধিক হারে মহিলাদেরকে সম্পৃক্ত করা এখন সময়ের দাবী।
- নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা: নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সে তুলনায় কার্যকর ও সফল সমিতির সংখ্যা বাড়ছে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে সমিতির সম্ভাব্যতা বিচার না করেই নিবন্ধন করা হচ্ছে। কাজেই এ বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।
- অভিযোগ তদন্ত, বিবাদ নিষ্পত্তি ও সমিতি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করা: যথাযথ দক্ষতা ও বিজ্ঞতার সাথে এ সকল কাজ সম্পাদিত না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা এবং আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে সমিতি ব্যবস্থাপনায় দ্বন্দ্ব ও বিবাদ স্থায়ীরূপ লাভ করে। কাজেই তদন্ত, বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি কাজে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তাদেরকে নিয়োজিত করতে হবে।
- অকার্যকর ও সম্ভাবনাহীন সমবায় সমিতিগুলোকে দ্রুততার সাথে অবসায়ন করা: বর্তমানে অসংখ্য সমবায় সমিতি অকার্যকর ও সম্ভাবনাহীন অবস্থায় বিরাজ করলেও এ সকল সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল বা অবসায়ন সমাপ্তকরণ বিষয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে এগুলোর পেছনে প্রতি বৎসর প্রচুর জনবল, সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। কাজেই এগুলোকে দ্রুত গুটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিতে হবে।
- সম্পদশালী অকার্যকর সমবায় সমিতিগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে অবসায়ন/বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: বর্তমানে কিছু শ্রেণীর সমবায় সমিতি রয়েছে যাদের সুনির্দিষ্ট কোনো সুবিধাভোগী নেই। কিন্তু এগুলোর মালিকানায় রয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ যা ক্রমেই বেদখল হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু সংখ্যক অসৎ ব্যক্তি বৎসরের পর বৎসর এগুলোর সুবিধা ভোগ করছে।

অনতিবিলম্বে এসকল সমিতি অবসায়নে দেয়া এবং প্রাপ্ত সম্পদ সমবায় উন্নয়ন ট্রাষ্ট বা ফাউন্ডেশন গঠনের মাধ্যমে সমবায়ের উন্নয়নে ব্যবহার করা অতি জরুরী ।

- সমবায় কৃষি ঋণ কার্যক্রম পুনঃ চালুকরণ: ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনয়নের জন্য বিশেষ করে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিদ্যমান বিতরণ ও আদায় পদ্ধতির সংস্কার ও নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি । তাছাড়া সমবায় খাতের অর্থায়নের জন্য একটি পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন-এর কথা ভাবা প্রয়োজন ।
- সমবায় সেক্টরের ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠা, ই-গর্ভনেন্স চালুকরণ সহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ ।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক উপরোক্ত করণীয়সমূহ দায়িত্ববোধসহ দক্ষতার সাথে পালনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

- সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা ও মালিকানা-চেতনা (sense of ownership) বৃদ্ধির জন্য নৈতিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।
- কর্মকর্তাদের সচলতা (mobility) ও কর্মদক্ষতা (efficency) বাড়ানোর জন্য যানবাহন সহ অন্যান্য লজিষ্টিক সাপোর্ট বাড়ানোর ব্যবস্থা নেয়া । উল্লেখ্য যে, কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী সমবায় বিভাগের কর্মকর্তাদের ব্যাপক ভ্রমনের আবশ্যকতা রয়েছে । কিন্তু মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় এ উদ্দেশ্য চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে ।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি সহ বদলী ও পদায়নের জন্য যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করা ।
- কর্মমূল্যায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থার সঠিক অনুশীলন এবং দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ।
- সমবায় সমিতির অডিট পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র অডিট ইউনিট স্থাপন ।

সমবায় অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশে সমবায় আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারী প্রতিশ্রুতি জরুরি । এ লক্ষ্যে **সরকারের জন্য করণীয়** বিষয়াদি হতে পারে নিম্নরূপ:

- জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় সমবায় নীতিমালা ঘোষণা । যে ঘোষণায় সংবিধানের **১৩** অনুচ্ছেদ অনুযায়ী **সমবায়ী মালিকানাকে** দেশের উন্নয়নে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে ।

পদের শ্রেণী	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	শূণ্য পদ সংখ্যা
২	৩	৪
প্রথম শ্রেণী	কর্মরত পদ -১৭৪ রিজার্ভ পদ- ১৫ মোট= ১৮৯	কর্মরত পদ -৩৬ রিজার্ভ পদ- ১৩ মোট = ৪৯
দ্বিতীয় শ্রেণী	৫৭১	৩৪৯
তৃতীয় শ্রেণী	২,৯১৩	৭৫৫
চতুর্থ শ্রেণী	১,২৩২	৩৪৪
মোট	৪,৯০৫	১,৪৯৭

- সমবায় আইনের সংশোধন করে সমবায় বান্ধবকরণ।
- সমবায় অধিদপ্তরের শূণ্যপদ পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের মঞ্জুরীকৃত মোট পদ সংখ্যা ৪,৯০৫টির মধ্যে শূণ্য পদের সংখ্যা ১,৪৯৭টি যা শ্রেণী ভিত্তিক নিম্নে দেখানো হ'ল।

সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দ্রুত শূণ্য পদ সমূহ পূরণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পদোন্নতির মাধ্যমে পুরণযোগ্য পদ সমূহে পদোন্নতি প্রদানের জন্য বিদ্যমান নিয়োগবিধি সংশোধন করার কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত নিয়োগ বিধি জারী হওয়ার সাথে সাথে পদোন্নতি প্রক্রিয়া শুরু করা প্রয়োজন। অপরদিকে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় শ্রেণীভূক্ত ৫৯৫টি পদে নিয়োগের জন্য সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবিলম্বে উক্ত ছাড়পত্র প্রয়োজন। ছাড়পত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে সরকারের প্রচলিত নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা জরুরি।

- জেলা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পদটি উন্নীতকরণসহ জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন: সমবায় অধিদপ্তরের মূল কাজ অনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলোকে অর্থবহ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের কাজটি মূলতঃ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। দেশে বর্তমানে প্রায় সকল পেশার মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচী আশ্রায়ন প্রকল্পের আওতায় সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় অনেক সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমবায় সমিতি বৃদ্ধির সংখ্যা অনুপাতে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বাড়লেও প্রয়োজনীয় যানবাহনসহ 'লজিষ্টিক সার্পোট' দেয়া হচ্ছে না। এমতাবস্থায় সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচী/ প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের বিদ্যমান জনবল কাঠামো (উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা - ১ জন, সহকারী পরিদর্শক - ২ জন, অফিস সহকারী বনাম কম্পিউটার অপারেটর- ১জন, এম,এল,এস,এস- ১ জন মোট- ৫ জন) সংশোধন পূর্বক জনবল বৃদ্ধিসহ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পদটি ২য় শ্রেণী হতে ১ম শ্রেণীতে এবং জেলা সমবায় কর্মকর্তার পদটি ১ম শ্রেণী (এন্ট্রি পদ-৯ম গ্রেড) হতে ন্যূনতম উপ-নিবন্ধক (৭ম গ্রেড) পদে উন্নীত করা প্রয়োজন। একইসাথে এ সকল কর্মকর্তার কাজের সুবিধার্থে উপজেলা পর্যায়ে মটর সাইকেল ও জেলা পর্যায়ে জীপ গাড়ী এবং কম্পিউটার সরবরাহ করা প্রয়োজন। সেই সাথে সমবায় কর্মকা- গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে সদর কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জীপ গাড়ী/ষ্টাফ বাস সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- বরিশাল ও সিলেট বিভাগে সমবায় অফিস স্থাপন: সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুন সৃষ্ট বরিশাল ও সিলেট বিভাগে সমবায় অফিস স্থাপন করা প্রয়োজন। সম্প্রতি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে উল্লেখিত ২টি বিভাগের সমবায় অফিস স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। যথা দ্রুত সম্ভব উল্লেখিত ২টি বিভাগীয় সমবায় অফিস স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।

১. বিদ্যমান জনবল কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিককরণ: ঢাকা শহরে সমবায় সমিতির সংখ্যা ও কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু লোকবল সংখ্যা অন্যান্য জেলার অনুরূপ। ফলে এসকল সমবায় সমিতির কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে সমবায় খাতের অনিয়ম ও সংঘাতের অধিকাংশই ঢাকা কেন্দ্রীক। কাজেই ঢাকা জেলাকে কমপক্ষে ৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ৩ জন কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করা অতীব জরুরী। একইভাবে বর্তমানে ঢাকা মেট্রোপলিটান অঞ্চলে মাত্র ৬টি থানা সমবায় অফিসারের পদ রয়েছে। ফলে লোকবলের অভাবে কোন থানাতেই সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে না। এমতাবস্থায় ৬টির স্থলে কমপক্ষে ১২টি থানা সমবায় অফিসারের এর পদ সৃজন একান্ত জরুরী। একইভাবে চট্টগ্রাম জেলাকে ২টি অঞ্চলে এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান এলাকায় ২টির পরিবর্তে ৪টি সমবায় অফিসারের পদ সৃজন জরুরী।

- নয়মিত পদোন্নতি প্রদান: বিসিএস ক্যাডারভূক্ত অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের তুলনায় বিসিএস সমবায় ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ খুবই সীমিত। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ চাকুরীতে প্রবেশের প্রায় ১৪/১৫বছর এন্ট্রি পদে চাকুরী করার পর পদোন্নতির সুযোগ পান। অথচ ঐ একই সময়ে অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাগণ ২/৩টি পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে ডেপুটেশনে বদলী ও রিজার্ভ পদের বিপরীতে পদোন্নতি বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- অতিরিক্ত নিবন্ধক পদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণ: বিসিএস ক্যাডারভূক্ত অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের ২য় স্তরের পদটি ৩য় গ্রেড অথবা তদুর্ধ গ্রেডভূক্ত। অথচ বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের ২য় স্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধকের পদটি ৪র্থ গ্রেডভূক্ত। ফলে অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের তুলনায় এ ক্যাডারের কর্মকর্তারা প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। কাজেই এ ক্যাডারের অতিরিক্ত নিবন্ধক পদের বেতন স্কেল ৪র্থ গ্রেড হতে ৩য় গ্রেডে উন্নীত করা যুক্তিসঙ্গত।
- প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমবায়-বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি বিনির্মাণে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু, এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ খুবই নগণ্য। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীকে জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকর করা যৌক্তিক।
- অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ: সমবায় অধিদপ্তর অতি প্রাচীন হওয়া সত্বেও এ অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন অফিস ভবন ছিল না। সম্প্রতি সমবায় অধিদপ্তরের জন্য নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হলেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। দাপ্তরিক কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা সমবায় কার্যালয় ভবনসহ ৬টি বিভাগীয় দপ্তরের জন্য নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ প্রয়োজন এবং সমবায় ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৬. "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে সমবায় আন্দোলন: সম্ভাবনা অসীম!

সংকটের আর্বতে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে দেশকে পুনরুদ্ধার করে আগামী ২০২০-২১ সালের মাহেন্দ্রক্ষণে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেয়ার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে

"রূপকল্প ২০২১" । সুনির্দিষ্ট ২২ টি লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি তার অর্থনীতি হবে দ্রুত বিকাশশীল, থাকবে না দারিদ্র্য, প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা । প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীরা ভোগ করবে সমান অধিকার, থাকবে আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ । এক্ষেত্রে সফলতা পরিমাপের নির্দেশক সমূহ হ'ল অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি উচ্চতম ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দ্রুততার সাথে দারিদ্র হ্রাস, অভ্যন্তরীন উৎপাদন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্রের অনুশীলন ইত্যাদি । এসবের সফল বাস্তবায়নে প্রয়োজন তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে আমাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সকল অর্থনৈতিক শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস । এসব শক্তির অন্যতম হ'ল "গণমুখী সমবায় আন্দোলন" ।

বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত 'গণমুখী সমবায় আন্দোলন' বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত "রূপকল্প ২০২১"-এর ২২টি সময়-নিদিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কতটুকু অবদান রাখতে পারে? বিষয়টি বুঝতে আমরা দেশের ২৬টি জেলার সমবায় সমিতির ৫৫ জন জ্ঞান-সমৃদ্ধ-অভিজ্ঞ সদস্যদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ধ্যান-ধারণা সংগ্রহ করেছি । আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, "রূপকল্প ২০২১"-এ প্রদেয় ২২টি সময়-নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটি (আলাদা-আলাদাভাবে) অর্জনে সমবায়-সমবায়ীদের ভূমিকা কি হতে পারে? অভিজ্ঞ-জ্ঞানসমৃদ্ধ সমবায়ীরা প্রায় ১,২০০ সুপারিশ দিয়েছেন, ধারণা-মতামত ব্যক্ত করেছেন । বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের অনেকগুলোই প্রায় অনুরূপ;

সারণি ২: "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে সমবায় এর ভূমিকা সম্পর্কে তৃণমূল-সমবায়ীদের সুপারিশ

লক্ষ্যমাত্রা ১ : ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার হবে ১০০ শতাংশ।
সুপারিশ : ১. প্রতি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে সমিতির সদস্যদের সন্তান কিংবা পোষ্যদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা । ২. প্রতিটি গ্রামে সমবায়ের মাধ্যমে স্কুল মনিটরিং করা ও অস্বচ্ছল পরিবারকে সরকারী সহায়তা দান করা । ৩. প্রতিটি গ্রামে সমবায় ভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা । ৪. সমবায়ের মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক স্কুলে যাওয়া নিশ্চিতকরণ এবং উপবৃত্তির হার বাড়াতে হবে । ৫. সমবায়ের মাধ্যমে স্কুল বিহীন গ্রাম গুলোতে ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' প্রকল্প জোরদার করা । ৬. যেহেতু আমাদের নিজস্ব স্কুল রয়েছে সেহেতু আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের বেতন ফুল ফ্রি অথবা হাফ ফ্রি করতে পারি । ৭. সমবায়ীরা ছোট ছোট উঠান বৈঠক, অভিভাবক সমবেশ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনা সভা আয়োজন করতে পারে ।

৮. সমবায় সমিতির প্রতিটি সদস্যের পরিবারকে তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে শিক্ষিত করার জন্য বাধ্য করতে হবে।

৯. শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহন করে সরকারকে সহায়তায় প্রচার চালিয়ে প্রয়োজনে গরীব মানুষের সন্তানদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. একিভুত ও যুক্তি নির্ভর উদ্দেশ্য নিয়ে সকল স্তরে সমবায়কে সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. মহল্লা ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির মাধ্যমে স্কুল তৈরী করে ভর্তির হার ১০০% করা সম্ভব হবে; বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে।

১২. প্রাথমিক সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা সমবায় অফিস থেকে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জেলার সকল প্রাথমিক সমিতিকে লিখিত চিঠি প্রেরণের মাধ্যমে জানাতে হবে এবং সদস্যদের সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে।

১৩. গ্রামীণ অবকাঠামোর প্রতি স্তরে সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের সদস্যদেরকে সমবায়ী সদস্য করে ভর্তি করা হলে ২০১০ সালের মধ্যে নিট ভর্তির হার ১০০ শতাংশ করা সম্ভব।

১৪. ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি রিপোর্ট/ ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৮১% (২০০০-২০০৭) এই হার ১০০% এ উন্নীত করার জন্য-

(ক) প্রতিটি গ্রামে গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতির এবং শহরের বস্তি এলাকায় এক বা একাধিক সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির সকল সমবায়ীদের সন্তান সন্ততিদের বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ে গমনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যার সন্তান স্কুলে যাবেনা তাকে সমবায় সমিতির সদস্য পদ হতে বহিষ্কার করার বিধান রাখা যেতে পারে।

(খ) সমবায় সমিতির সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সকল সদস্যের সন্তানদের স্কুলে গমনের সুফল বিষয়ে ধারণা দেয়া যেতে পারে।

সকল সফল সমবায় সমিতিকে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

১৫. দেশের সর্বত্র সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সকল মানুষকে সমবায়ে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

১৬. শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সমবায়ীদের মধ্যে সচেতনতা অধিক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

১৭. সার্বিক গ্রাম সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক তথ্য তৈরী করে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির সংখ্যা নির্বাচন পূর্বক সাপ্তাহিক বৈঠকে বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে।

১৮. স্কুল সমবায় করতে হবে। অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে। প্রত্যেক সমবায়ীর সন্তানকে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১৯. সমবায়ীদের সচেতন করে স্কুল পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

২০. সমবায়ীদের অঙ্গীকার করতে হবে যে, নিজেদের ১০০% সন্তানকে স্কুলে পাঠাবে।

২১. প্রাথমিক স্তরে প্রথমে ৫ বছর বয়সী শিশুদের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে তাদের ৬ বছর বয়স হলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়তনে ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের শিক্ষিত যুবকদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা

চালু করা যেতে পারে। এজন্য বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যারা বয়স্ক শিক্ষা চালু করেছে তাদের সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২২. দেশে বিদ্যমান প্রায় ১ লক্ষ সমবায় সমিতির সাথে প্রায় ১ কোটি সমবায়ী সম্পৃক্ত। এদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

লক্ষ্যমাত্রা ২ : ২০১১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমবায়ীদের মধ্যে নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

২. সমবায় এর ভিত্তিতে প্রতিটি পাড়া, মহল্লায় গভীর নলকূপ স্থাপন এবং তদারকীর ভার প্রদান।

৩. গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশে সমবায় ভিত্তিক সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৪. এলাকায় সমবায় ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির মাধ্যমে পানির পাম্প বসিয়ে পানির ব্যবস্থা করা যায়।

৫. সমিতির সকল সদস্যকে এ ব্যাপারে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা।

৬. এনজিও গুলো যারা বিদেশী সাহায্য পায় তাদেরকে বাধ্য করা।

৭. সমিতির প্রতিটি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানির সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৮. এলাকার নিরাপদ পানির জন্য সকলে মিলে চাপকল অথবা ডিপকল এর ব্যবস্থা করা যাতে পানির লাইন পয়ঃনিষ্কাসন থেকে আলাদা হয়।

৯. সরকারী সহায়তায় সমবায় সমিতি সমূহের মাধ্যমে শহর ও গ্রামে গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে।

১০. ২০১১ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সদস্যদের মাঝে সমিতির সদস্যদের কম মূল্যে টিউবয়েল সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় বিশেষ নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। পানি দুষণ প্রতিরোধে জনসচেনতা সৃষ্টি করতে হবে।

১১. প্রত্যেক সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে নলকূপ সরবরাহ করে অধিকহারে নলকূপ স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন পানি শোধনের ঔষধ সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সমবায় সমিতি এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

১২. সমবায়ীদের মধ্যে সুপেয় পানি ব্যবহারের জন্য ঋণ প্রদান করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন করা।

১৩. নিজস্ব উদ্যোগে সমবায়ীদের নলকূপ স্থাপনের পরিকল্পনা করতে হবে।

১৪. সমবায়ীদের স্ব-উদ্যোগে গভীর অগভীর নলকূপ স্থাপনে যৌথ উদ্যোগের উদ্ভব করতে হবে।

১৫. সার্বিক গ্রাম সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা যাবে।

১৬. সমবায়ীদেরকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সুপেয় পানি সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব এবং এজেন্ট নিয়োগ করা যেতে পারে।

১৭. এলাকাভিত্তিক আর্থিক সংশ্লিষ্টতাসহ সমবায় সমিতিগুলি স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সহযোগিতা করবে।

১৮. সমবায় সমিতিগুলোতে গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন করে ভূ-গর্ভস্থ পানি সরবরাহ এবং

ভূ-উপরিভাগের পানি শোধনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদস্যদের এবং পরিবারের সকলের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৯. পুকুর, পুয়া ইত্যাদি সংস্কার ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সুপেয় পানির আধার সৃষ্টি করা যেতে পারে। এ সমস্ত কাজে সমবায় সংগঠনের সদস্যদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সাথে সাথে আর্সেনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপনে সদস্যদের কাজে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তন সমূহে প্রশিক্ষণে সমবায়ীদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে এবং সমবায় বিভাগের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ইউনিটকে সক্রিয় করা যেতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রা ৩ : ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন করা হবে।

সুপারিশঃ

১. কৃষিতে সম্পৃক্ত সমবায়ীদের উদ্বুদ্ধ ও কারিগরী সহায়তা দান।

২. সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ করা।

৩. এলাকা ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতির মাধ্যমে রেশনের ব্যবস্থা করা।

৪. গ্রাম অঞ্চলে কৃষি সমবায় সমিতির সদস্যকে কৃষি উপকরণগুলো বিনা মূল্যে দেওয়া।

৫. সকল পতিত ও অনাবাদি জমি সমবায় ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে চাষের আওতায় আনতে হবে।

৬. এলাকার সকলে মিলে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা, ক্ষুদ্র কৃষি ঋণের মাধ্যমে সাহায্য করা, দামের ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া– সমবায়কে সম্পৃক্ত করা।

৭. কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকদের সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করা।

৮. কৃষকদের জন্য সরকারী সহযোগিতায় নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য ট্রেনিং এর আয়োজন করা এবং তাতে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা।

৯. কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, সার ইত্যাদি সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরকারের ভতুর্কি দিয়ে স্বল্প মূল্যে এবং সেচ কাজের জন্য স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে।

১০. সমবায় সমিতি গঠন করে রেশনের মাধ্যমে।

১১. কৃষি সমবায় সমিতির সদস্যদের কম সুদে কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সমবায় সমিতিসমূহ অতীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে প্রত্যেক গ্রামের খাদ্যশস্য উৎপাদনের দায়িত্ব সমবায় সমিতির উপর ন্যাস্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া সমস্ত প্রকার কৃষি উপকরণ যেমন সার, বীজ সেচ ও কীটনাশক বণ্টনের দায়িত্ব সমবায় সমিতি সমূহের উপর ন্যাস্ত করা যেতে পারে।

১৩. দেশের সমবায় সমিতির মাধ্যমে বা সদস্যদের সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কৃষজাত সামগ্রী (সার, কিটনাশক, ট্রাক্টর ইত্যাদি ক্রয়) ক্রয় করতে সহযোগিতা করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়।

১৪. সমবায় ভিত্তিক কৃষি খামার গঠন করে সদস্যদের ভাল বীজ ও সার প্রদান করে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করা সম্ভব।

১৫. সমবায়ীদের আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. কৃষি উৎপাদকদের সমবায় ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা।

১৭. সমবায় ভিত্তিক হাইব্রিড চাষাবাদ ও বীজ ব্যবহারে সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১৮. প্রত্যেক গ্রামে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

১৯. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারে সমবায়ীদের অগ্রাধিকার দেয়া এবং সক্রিয়া সহযোগিতা করা ।

২০. কৃষি খাতে সমবায় কর্তৃক বিনিয়োগ । যেমন প্রশিক্ষণ ঋণ ইত্যাদি ।

২১. সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় উন্নত বীজ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে পারে ।

২২. সংগঠিত কৃষি ও কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতিতে খাদ্য স্বয়ং স্পূর্ণতা অর্জন করা যায় ।

২৩. আবাসন/হাউজিং বন্ধ করা এবং আবাদী জমি বৃদ্ধি করা– এ ক্ষেত্রে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা ।

২৪. খাস জমি সমবায়ীদের মধ্যে বরাদ্দ করা ।

লক্ষ্যমাত্রা ৪ : ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়ীকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমিতির সভ্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ।

২. সমবায় সমিতির মাধ্যমে সরকারী সহযোগিতায় প্রতিটি পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা ।

৩. এলাকা ভিত্তিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা যায় ।

৪. স্থানীয় সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা ।

৫. এলাকার সকলে মিলে সবাইকে স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতন করা

৬. ঋণের মাধ্যমে বিনামূল্যে দরিদ্রদের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা এবং প্রক্রিয়ায় সমবায়কে সম্পৃক্ত করা ।

৭. সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের পরিবারকে বিনা সুদে সরকার থেকে ঋণ দিয়ে স্যানিটেশন টয়লেট ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

৮. গ্রামে গ্রামে সার্বজনীন স্যানিটেশন সমবায় গড়ে তোলা ।

৯. সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে স্যানিটেশন সামগ্রী উৎপাদন করা ও তা কম মূল্যে বিতরণের উদ্যোগ নেয়া ।

১০. সমবায়ের মাধ্যমে এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ করে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবহারের সুফল তুলে ধরে স্যানিটেশন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে । সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে গিয়ে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে । সমবায় সমিতি সমূহ নিজস্ব উদ্যোগে সমিতির সকল সদস্যের বাড়িতে তাদের লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে । তাছাড়া সমিতিসমূহ সেনিটারী পায়খানা স্থাপনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেও স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে ।

১১. সমবায় সমিতির মাধ্যমে বা সদস্যদের ঋণ দিয়ে 'একটি বাড়ী' 'একটি পায়খানা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে ।

১২. সমবায়ীদের ক্ষুদ্র ঋণদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনে আগ্রহী করা ।

১৩. প্রতিটি গ্রামে সার্বিক গ্রাম সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক গ্রাম তথ্য বই তৈরী করে বছর ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহন করে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা তৈরী করা সম্ভব ।

১৪. সরকারী সহযোগিতায় সমবায় সমিতির সদস্যদের রিং স্লাব সরবরাহ করা এবং এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১৫. জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্যানিটেশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সদস্যদের / জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সভা ও স্বল্প/ বিনামূল্যে স্যানিটেশন সরঞ্জমাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১৬. সমবায় সমিতি বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালু করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা ইউনিযন পরিষদ, এনজিও, পৌরসভা, থানা স্বাস্থ্য কর্মসূচী ইত্যাদি স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সংগ্রহ করতে পারে এবং স্যানিটেশনের উপর সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ নিতে পারে। সদস্যরা পায়খানা তৈরীর প্রশিক্ষণ নিয়ে কমিউনিটি লেভেল পায়খানা তৈরী করে বিক্রয় করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বেকারত্ব দূরীকরণের সাথে সাথে প্রতিটি বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালু হবে।

লক্ষ্যমাত্রা ৫ : ২০১৩ সালে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে এই হার ১০ শতাংশ উন্নীত করে অব্যাহত রাখা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমিতির সভ্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার সার্বিক মান উন্নয়ন ঘটানো এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন করা।

২. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতি সঞ্চালন তথা সমবায় ভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহন।

৩. সমবায় সমিতি গঠন করে হাঁস মুরগীর খামার, গবাদি পশুর খামার, টেইলারিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিলে দেশের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

৪. এলাকার সকলে মিলে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার সাহায্য করা এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা। কাজটি সমবায়ের মাধ্যমে করা।

৫. কাঁচামাল উৎপাদন পণ্য সমবায়ীদের মাধ্যমে যাতে ভোক্তার হাতে পৌছায় এ ধরণের উদ্যোগ হাতে নিলে রাজস্ব খাতে আয় বাড়বে।

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সমবায়কে শক্তিশালী করা।

৭. সমবায় সমিতির মাধ্যমে নুতন নুতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৮. প্রত্যেক এলাকায় সমবায় সমিতি গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন করা।

৯. সমবায় সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

১০. সমবায় সমিতিসমূহকে খাদ্য উৎপাদনের দায়িত্ব প্রদান করে যদি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যায় তবে দেশে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১১. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান যে গুলো বছরের পর বছর ধরে অলাভজনক সে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে হস্তান্তর করে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব।

১২. সমবায় সমিতিসমূহ যদি নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সহজ শর্তে শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ দেয়া হয় তবে উক্ত খাত থেকে ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১৩. সকল সমবায়ীদের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

১৪. অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন গতিশীল করতে হবে এবং উৎপাদনশীল খাতে সমবায় ভিত্তিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে।

১৫. সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্র করে বিরাট মূলধন গঠন করা; এই মূলধন উৎপাদনমুখী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

১৬. ব্যাপক হারে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির আন্দোলকে সমবায়ের অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা।

১৭. কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে সমবায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।

১৮. সমবায় সংগঠনের মূলধন, সম্পদ, জমি, জনবল ও প্রশিক্ষণ কৌশল ইত্যাদির সদ্ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে সদস্য তথা স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্পদের সুসম বন্টন করা এবং সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ করা গেলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব।

লক্ষ্যমাত্রা ৬ : ২০১৩ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুতের সরবরাহ হবে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমিতির সকল সদস্যদের এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার নিশ্চিত করা ও বিদ্যুতের অপচয় রোধ করা এবং সৌর বিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটানো।

২. সমবায় এর ভিত্তিতে অঞ্চল ভিত্তিক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও তার ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব উক্ত সমবায়কে প্রদান যার মাধ্যমে বিদ্যুতের সুষ্ঠু বিতরণ এবং বিল আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান।

৩. সমবায় সমিতি গঠন করে গবাদি পশুর খামার করে পশু পালন করলে সেখান থেকে বর্জ্য দিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করা সম্ভব।

৪. সমিতিগুলো যৌথ বিনিয়োগ করে বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। এজন্য প্রত্যেক উপজেলায় অন্তত একটি করে সমবায় সমিতি গড়ে তুলে এর মাধ্যমে সরকারের সহযোগিতায় ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় গ্রীডে যোগ করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. বৃহৎ সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান করতে হবে।

৬. সমবায় সমিতিসমূহ সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রামের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাছাড়া বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে সাধারণ সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭. সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং জনগণকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হতে সচেতন করা।

৮. গ্রাম ভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী করে বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা অতি সহজেই করা যায়। এছাড়া শহরাঞ্চলে এলাকা ভিত্তিক বর্জ ব্যবস্থাপনা সমবায়ের মাধ্যমে বর্জ ব্যবহার করে

বিকল্প জ্বালানীর উৎস্য তৈরী করা সম্ভব ।

৯. দেশের যে সমস্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ আছে সে সমস্ত এলাকার প্রতিটি সমবায় সমিতিতে "বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধ" সেল গঠন পূর্বক আইনগত সংস্থাকে সংবাদ/তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি রোধ করা যেতে পারে ।

লক্ষ্যমাত্রা ৭ : ২০১৩ সালে পর্যায়ক্রমে স্নাতক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমিতির মাধ্যমে সকল গ্রামের আওতাধীন স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান ।

২. মেধাবী এবং অস্বচ্ছল ছাত্রদের সমবায় এর মাধ্যমে সহায়তা করা ।

৩. সমবায় সমিতি গঠন করলে সদস্যদের ছেলে মেয়েকে স্নাতক পর্যন্ত পড়া লেখার সুবিধা দেয়া ।

৪. সমবায়ের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সুদবিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা ।

৫. সরকার সমিতিগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা খাতের সহায়তা প্রদান করতে পারে ।

৬. এই কার্যক্রম সরকার গ্রহণ করলে সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে জনমত গড়া ও সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা ।

৭. সমবায় সমিতির বাৎসরিক আয় হতে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ।

৮. সমবায়ী সদস্যদের সন্তানদের স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ।

৯. সমবায় সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে স্নাতক পর্যন্ত কন্যা সন্তানদের শিক্ষা অবৈতনিক করা ।

১০. দুঃস্থ সমবায়ীদের সন্তান-সন্ততিদের বিনা মূল্যে স্নাতক শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা ।

১১. সমবায়ের মাধ্যমে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব ।

১২. শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় সমবায়ের ভিত্তিতে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করা ।

লক্ষ্যমাত্রা ৮ : ২০১৪ সালে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

সুপারিশ :

১. সমিতির সভ্যদের উদ্বুদ্ধকরণ ও অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ ।

২. সমবায় সমিতির মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা চালু এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ।

৪. এলাকা ভিত্তিক সমবায় সমিতি গঠন করে সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ।

৫. সমবায়ের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চালু করা ।

৬. বয়স্ক শিক্ষা ও পথশিশুর শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব । যা কেবল সমবায় সমিতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভব ।

৭. এলাকা ভিত্তিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্কুল তৈরী করে ।

৮. সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরক্ষরতা মুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করতে হবে ।

৯. নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিসমূহ নিম্নলিখিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে:

(ক) প্রত্যেক সমবায় সমিতির সকল সদস্যকে অন্তত অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে মর্মে বিধান থাকতে

হবে।

(খ) সদস্যদের সন্তানকে স্কুলে না পাঠালে সমবায় সমিতি থেকে তার সদস্য পদ বাতিল করা হবে মর্মে বিধান রাখা যেতে পারে।

(গ) সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে নিরক্ষরতার অভিশাপ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার সভা সমাবেশের মাধ্যমে ধারণা দিতে হবে।

১০. সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে আরো জোরদারভাবে এগিয়ে যাওয়া।

১১. গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক প্রকৃত নিরক্ষর লোকদের চিহ্নিত করা সহজতর। অতঃপর গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে নৈশ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

১২. দুঃস্থ সমবায়ীদের সন্তান-সন্ততিদের বিনা মূল্যে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা।

১৩. সমবায় সমিতিগুলিতে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসহ স্কুল পরিচালনা করা যেতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রা ৯ : ২০১৫ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সকল স্তরের মানুষের আবাসনের আওতা বৃদ্ধি করা ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি সেবা শিল্প খাতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমবায়ীদের সম্পৃক্তকরণ ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করা এবং কারিগরী সহায়তা দান।

২. সমবায় সমিতিকে সরকারী খাস জমি বরাদ্দ এবং বহুতল ভবন করার অনুমতি প্রদান এবং সরকারী ঋণ যাহা ফেরতযোগ্য।

৩. সমবায় সমিতির মাধ্যমে জমি ক্রয় করে তার মধ্যে ফ্ল্যাট তৈরী করে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে সকলের আবাসন সমস্যা সমাধান করা যায়।

৪. সমিতির সদস্যবৃন্দ সম্মিলিতভাবে গুচ্ছ গ্রামের মত নিজস্ব আবাসিক এলাকা গড়ে তুলতে পারেন।

৫. তৃণমূল মানুষের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে আবাসনের ব্যবস্থা করা।

৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প আশ্রয়ন আবাসনের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেখানে সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে।

৭. সমবায় ভিত্তিক গৃহ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প গঠন করে প্রত্যেকটি সদস্য সদস্যাদের আবাসন ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৮. সমবায় ভিত্তিক আবাসন প্রকল্প নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্লটের চেয়ে ফ্ল্যাট ভিত্তিক আবাসন করতে হবে।

৯. বসবাস উপযুক্ত দেশের পতিত জমি সমবায়ের মাধ্যমে অধিগ্রহণপূর্বক সদস্যদের সমন্বিত শক্তির দ্বারা আবাসন সমস্যা অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে। আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক আবাসন সমবায় সমিতি গঠন কিংবা বিদ্যমান সমবায় সমিতি কার্যক্রমের সাথে আবাসন সমস্যা নিরসনে বিষয়টি সংযুক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভূমি অধিদপ্তরের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সমিতি পর্যায়ে যোগাযোগ করে দেয়া যেতে পারে।

লক্ষ্যমাত্রা ১০: ২০১৫ সালে জাতীয় আয়ের বর্তমান হিস্যা কৃষিতে ২২, শিল্পে ২৮ ও সেবাতে ৫০ শতাংশের পরিবর্তে হবে যথাক্রমে ১৫, ৪০ এবং ৪৫ শতাংশ।

সুপারিশঃ

১. সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকাতায় বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

২. কৃষি-শিল্প-সেবা খাতে সম্পৃক্ত সমিতির সভ্যগণকে এ বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩. কৃষির উপর নির্ভর না করে সমিতির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরী করলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৪. কৃষি, শিল্প ও সেবা মূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ এর ব্যবস্থা করা।

৫. সমবায় সমিতির মাধ্যমে গার্মেন্টস, কুটির শিল্প, বস্ত্রশিল্প, মৃৎ শিল্প কারখানা তৈরী করে তোলা সম্ভব।

৬. দিনদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষিজমি কমে যাচ্ছে, এ সমবায়ী শিল্পের দিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৭. সমবায় সমিতির মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে হবে। অধিক হারে শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হলে কৃষির উপর চাপ কমে যাবে এবং শিল্প খাতে অবদান বৃদ্ধি পাবে। শিল্প খাতে ব্যক্তি মালিকানার সাথে সাথে সমবায় ভিত্তিক মালিকানাকে উৎসাহিত করতে হবে।

৮. সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি এবং শিল্পে বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের হিস্যা বাড়াতে হবে।

৯. সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপন করা।

১০. কৃষি আধুনিকীকরণ ও যাবতীয় উপকরণ সমবায়ের মাধ্যমে বিতরণ, সরকার ও সমবায় সমিতির যৌথ অংশীদারিত্বে মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ ও সমবায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবা খাতের সম্প্রসারণ।

লক্ষ্যমাত্রা ১১ : ২০২১ সালে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ থেকে ১৫ শতাংশে নেমে আসবে।

সুপারিশঃ

১. অধিক হারে সফল যুব সমিতি গড়ে তোলা এবং আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে অনু-ক্ষুদ্র-মাঝারি ঋণ দান।

২. প্রতিটি গ্রামে ইউনিয়নে এবং উপজেলায় সমবায় সমিতি গড়ে তোলা এবং তাদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

৩. সমিতির মাধ্যমে হাসমুরগীর খামার, পশু খামার, শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরী করে বেকারত্ব দূর করা।

৪. সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও যুব সমাজকে কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. যেসব যুবক ইতোমধ্যে যুব অধিদপ্তরের অধীনে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং বেকার তাদের নিয়ে

কর্মসংস্থান-সৃষ্টি সমবায় গঠন করা এবং সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঋণ দেয়া।

৬. সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। যদি সরকার সর্বক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৭. বেকারত্ব দূরীকরণ সমবায় বিভাগ সবচেয়ে ভূমিকা রাখতে পারে ঃ

ক) প্রত্যেক গ্রামে এবং মহল্লায় বেকার যুবকদের সমন্বয়ে একটি করে সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে।

খ) উক্ত বেকারদের কোন একটি বিশেষ ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সহজ শর্তে কিছু ঋণ দিয়ে উক্ত ট্রেডের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য চাষ, গরু-ছাগল, হাঁস মুরগী পালন, সবজি উৎপাদন, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বাজারজাতকরণ, সেলাই প্রকল্প, কম্পিউটার, তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮. স্বল্প আয়ের মানুষদের সমবায়ী চেতনায় গড়ে তুলে সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী খাতে উৎসাহিত করে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনা।

৯. বেকারত্ব দূর করতে সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা।

১০. সমিতির মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনের চিন্তা করতে হবে।

১১. সমবায় নিবন্ধন এর শর্ত হিসেবে প্রত্যেক সমবায়কে কর্মসংস্থান মূলক শিল্প ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, হাঁস মুরগী-গরু ছাগল ইত্যাদি খামার সৃষ্টি করা।

১২. সমবায় সমিতির মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প খাতে নিবিয়োগ করা।

১৩. বিভিন্ন সমবায় সংগঠনের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড যেমন সেলাই প্রশিক্ষণ, ইলেকট্রিক প্রশিক্ষণ, মৌমাছি চাষ, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ মেরামত ইত্যাদিতে সম্পৃক্ত করে তাদের বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে।

১৪. সমবায় সমিতিগুলোকে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করে বেকারত্ব নিরসন করা যায়।

লক্ষ্যমাত্রা ১২ : ২০২১ সালে কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ৪৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশে।

সুপারিশঃ

১. সমিতির সভ্যদের কারিগরি শিক্ষায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে শিল্পে নব জাগরণ ঘটানো।

২. শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত সমিতির সভ্যদের কর্মসংস্থান ও কারিগরি শিক্ষা দান করা।

৩. সমিতির মাধ্যমে শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে কৃষি উপর নির্ভর কমে আসবে।

৪. সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি খাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা।

৫. এই কর্মসূচী সফল করতে হলে বর্তমানে কৃষিতে ব্যবহৃত সনাতন পদ্ধতির উপকরণ এর ব্যবহার কমিয়ে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষদের সচেতন করে সরকারের সহযোগিতা এবং সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৬. সমবায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানার সাথে সাথে সমবায় ভিত্তিক মালিকানার মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে কৃষি খাত থেকে শ্রম শক্তি শিল্প বা সেবা খাতে স্থানান্তর করা সম্ভব।

৭. সমবায় ঋণের মাধ্যমে অথবা সমবায় থেকে প্রকল্প প্রণয়ন করে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি শ্রম কমিয়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো সম্ভব।

৮. সমবায়ীদেরকে ছোট-মাঝারী শিল্পে কারখানা স্থাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

৯. সমবায় ভিত্তিতে কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে।

লক্ষ্যমাত্রা ১৩ : ২০১১ সালে শিল্পে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে এবং সেবা খাতে ৩৬ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

সুপারিশঃ

১. শিল্প ও সেবা খাতে সমবায়ীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ দান ও প্রণোদনা দানের ব্যবস্থা করা।

২. সমবায়ের ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে শুল্ক মুক্ত রপ্তানির রপান্তির ব্যবস্থা করা– তাহলে সকলে উৎসাহী হবে। সমিতির সভ্যগণকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও অংশগ্রহন করা।

৩. সমিতির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে সেবা খাতে উন্নয়ন সম্ভব।

৪. শিল্প খাতে মালিক-শ্রমিকগণকে সমবায় সম্পর্কে সচেতন করা; মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সমবায় আন্দোলন জোরদার করা; সমবায়ের বিভিন্ন সভা সেমিনারে শিল্পমালিক ও শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫. এই কর্মসূচী সফল করার জন্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প এবং হাসপাতাল ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে।

৬. সমবায় খাতকে সার্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থানা পর্যায়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করে বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে ঋণ সুবিধা দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা গড়ার কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

৭. সমবায়ের মাধ্যমে শিল্প ও সেবা খাতে শ্রমশক্তি বৃদ্ধি করার ব্যপারে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

৮. সমবায় ভিত্তিক যৌথ শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

৯. সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে সেবা খাত উন্নত হবে।

১০. সমবায়ীরা সেবক হতে পারে এমন কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

১১. সমস্ত বন্ধ পাট কল সমবায় ভিত্তিতে চালুকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা ১৪ : ২০২১ সাল নাগাদ বর্তমান দারিদ্রের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশ নামবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায় সমিতির মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

২. সমবায় ভিত্তিতে যদি প্রতিটি গ্রামকে সমবায় এর মাধ্যমে স্বাবলম্বি করে তোলা যায়।

৩. দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশ নামবে।

৫. দারিদ্রতা যে একটি অভিশাপ সে সম্পর্কে সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

৬. সমবায়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শেষে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা। কার্যক্রম সমবায় দ্বারা মনিটরিং করা।

৭. এই কর্মসূচী সফল করতে হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে এবং সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে হাঁস, মুরগী, গাভী পালন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৮. সমবায়ীদের কারিগরী, শিল্প ও কৃষিতে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

৯. সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ।

১০. একমাত্র সমবায়ই ক্ষুদ্র ঋণের সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্রের হার কমাতে পারে ।

১১. সমবায়ের সদস্যদেরকে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা ।

১২. সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু করে প্রান্তিক দারিদ্রকে ঋণ কার্যক্রমে আওতায় আনতে হবে ।

১৩. যে সকল কার্যালয়ে শূন্য পদ রয়েছে সে সকল শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ করা ।

১৪. সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বল্প স্বল্প পুজি সংগ্রহের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র্যের হার কমানো সম্ভব ।

১৫. সমিতিগুলি এলাকাভিত্তিক চাহিদা মাফিক উদ্যোগ নিতে পারে ।

১৬. সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প চালু করা ।

লক্ষ্যমাত্রা ১৫: ২০২১ সালে তথ্য প্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায় ভিত্তিতে প্রতিটি গ্রাম, মহল্লায় তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা ।

২. সমিতির সভ্যদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ দান ।

৩. সমবায় ভিত্তিক প্রতিটি সমবায়ী প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সমবায়ী সদস্যদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব ।

৪. কৃষি অর্থনীতিতে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে সমবায় সমিতির মাধ্যমে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে । এক্ষেত্রে বাংলাদেশ টিভিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে ।

৫. সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই সমবায় বিভাগ গ্রাম পর্যায়ে সমবায়ীদেরকে কম্পিউটারসহ উন্নত তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে । অধিকাংশ সফল সমবায় সমিতিতেই কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে । সরকারের ন্যূনতম সহযোগিতা পেলে ২০২১ সাল নয় বরং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার সহ তথ্য প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে । ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সমবায় বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ।

৬. আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নে সমবায় সমিতিতে প্রশিক্ষণ চালু কর ।

৭. সমবায় সমিতির হিসাবসমূহ কম্পিউটার সফ্টওয়ারের মাধ্যমে সংরক্ষণ ।

৮. সমবায় সমিতি ভিত্তিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার সম্প্রসারণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টি করা ।

৯. সমবায়ী ও তাদের সন্তানদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা যায় ।

১০. সমবায়ীদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ।

১১. সমবায়ের মাধ্যমে আইটি সেক্টরকে শক্তিশালীকরণ ।

লক্ষ্যমাত্রা ১৬ : ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায় এর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম-মহল্লায় সচেতনতার সৃষ্টি এবং শাকসবজি, হাঁস মুরগী, ফলমূল এর গাছ রোপন ।

২. সমিতির মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক ফলজ বৃক্ষ রোপন করে সেখানে ফল পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ।

৩. সমবায় সমিতির সহযোগিতায়

ক) দেশের সকল জনসাধারণকে মানসম্মত পুষ্টি চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করা ।

খ) জাতীয় ও আন্তজার্তিক পুষ্টি দিবস, সভা, সেমিনার, উঠান বৈঠক এবং পুষ্টি মেলা আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা ।

গ) সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতায় নারী ও শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা ।

ঘ) গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে পুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা সভার আয়োজন করা ।

ঙ) ফলজ বৃক্ষ রোপন অভিযান আন্দোলনে রূপ দেয়া ।

৪. সমবায় সমিতির মাধ্যমে পুষ্টিযুক্ত খাদ্য দ্রব্য কমমূল্যে উৎপাদন এর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে ।

৫. নাগরিকদের পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন পুষ্টি সম্পন্ন খাবারের পরিচিতি জানাতে হবে । তাদের নিজের জমিতে পুষ্টি সম্পন্ন শাক-সবজী ফলমূল ও মৎস্য চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে । যাতে তারা তাদের নিজেদের পুষ্টির চাহিদা নিজেরাই পুরণ করতে সক্ষম হন ।

৬. যুব সমবায় সমিতির মাধ্যমে যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে হাঁস মুরগী, গরু-ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, সাক সবজি উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে দেশের পুষ্টি চাহিদা অচিরেই পূরণ করা সম্ভব ।

৭. সমবায়ীদেরকে স্বল্প ঋণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে মান সম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।

৮. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনসহ সমবায়ীদেরকে খাদ্য পুষ্টিমান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে ।

৯. সমবায়ীদেরকে গবাদিপশু ও মৎস্য চাষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে ।

১০. এলাকা ভিত্তিক সমবায় সমিতি গুলোকে দায়িত্ব দেয়া হলে চাহিদা পূরণ হবে ।

১১. সমবায় ভিত্তিক সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ।

১২. পারিবারিক পর্যায় সদস্যগণকে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন, গাভীর কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অধিক দুগ্ধ উৎপদান, দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ, মৎস্যচাষ, সবজি চাষাবাদ, ফলফলাদির আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে । সে-উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করতে হলে সমবেতভাবে কাজ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সমবায়ের কোন বিকল্প নেই ।

১৩. সমবায় মহিলা সমিতির মাধ্যমে দেশের মহিলাদের কে পুষ্টি জ্ঞান দিয়ে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় ।

লক্ষ্যমাত্রা ১৭ : ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলোক্যালোরির উর্ধ্বে খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায় ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্য সুষম হারে বন্টন করা সম্ভব ।

২. সমিতির সভ্যদের সুষম খাবার সম্পর্কে জ্ঞান দান নিশ্চিতকরণ ।

৩. সরকার সমিতির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে সঠিক দারিদ্র লোক উপকৃত হবে ।

৪. সমবায় ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এর নিশ্চয়তা এবং সচেতনতার মাধ্যমে দৈনিক সঠিক পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে ।

৫. সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি পণ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, যুবকদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন মৎস্য চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের জনগণের প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালেরির উর্ধ্বে খাদ্যমান নিশ্চিত করা সম্ভব ।

৬. সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি খামার স্থাপন ।

৭. সমবায় ভিত্তিক উৎপাদনমুখী কৃষি ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুযোর্গ ব্যবস্থা করা ।

৮. সমবায়ীদের সম্পৃক্ত করে পুষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা ।

৯. সমবায়ের মাধ্যমে ডেইরী খামার প্রতিষ্ঠা করা ।

১০. সমবায় সমিতির মাধ্যমে ফলের বাগান, গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করা ।

লক্ষ্যমাত্রা ১৮ : ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায়ীদের প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ।

২. সমবায় এর মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে মাসে একটি করে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা করা এবং সকলকে প্রয়োজনীয় ম্যাসেজ পৌঁছে দেয়া ।

৩. সমিতির সভ্যদের সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ।

৪. সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের রোগ জীবাণু সম্পর্কে জ্ঞান দিলে সংক্রামক ব্যাধি নির্মুল সম্ভব ।

৫. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে ।

৬. ঔষধী গাছ বেশী লাগাতে হবে ।

৭. সংক্রামক ব্যধি সম্পর্কে সমবায়ের মাধ্যমে জনসাধারণেকে সচেতন করা; সরকারী সহযোগিতার মাধ্যমে সংক্রামক ব্যধির ঔষধ ও প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা ও সরবরাহ করা ।

৮. সমবায় ভিত্তিক জনগণকে বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে টিকা ও ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব ।

৯. সমবায় বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে । সমবায় সমিতির

শিক্ষিত বেকার সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন টিকা প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

১০. সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রচারণা ও প্রতিকারের প্রকল্প গ্রহন করে।

১১. এলাকা ভিত্তিক সমিতিগুলো একত্রিত হয়ে পরিষ্কার পরিছন্ন পরিবেশ গড়ে তুললে।

১২. সমবায় সমিতির সদস্যদেরকে স্বাস্থ্য সেবার প্রশিক্ষণ দিয়ে সংক্রামক ব্যাধি নির্মুল করা যায়।

লক্ষ্যমাত্রা ১৯ : ২০২১ সালে গড় আয়ুস্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীত করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায়ের মাধ্যমে যদি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বি করা যায় তবেই সম্ভব।

২. সমিতির সভ্যদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

৩. ভেজাল খাদ্য ও অতিরিক্ত সার, ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং তা গ্রহণ করে অকাল মৃত্যু ঘটছে। সমবায়ের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা।

৪. ২০২১ সালে গড় আয়ুস্কাল ৭০ এর কোঠায় উন্নীত করতে হলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। যুব সমাজকে মাদক ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সেবা দিতে হবে।

৫. সমবায় ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন এবং সঠিক খাদ্যাভাসের মাধ্যমে গড় আয়ু বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬. সমবায়ের মাধ্যমে জনগণকে তাদের জীবন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৭. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত, পরিমিত আহার বিহার, নিয়মিত ব্যায়াম, সুষম খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও এতদসংক্রান্ত শিশু কিশোরীদের, গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থানা সমবায় সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচার চালিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। জনগণ ধর্মীয় অনুশাসন ও মাদক দ্রব্য এড়িয়ে চলতে পারলে আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে সমবায়ের বিকল্প নেই।

লক্ষ্যমাত্রা ২০ : ২০২১ সালে শিশু মৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে কমিয়ে ১৫ করা হবে।

সুপারিশ :

১. মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সক্রিয় সচেতনতা ও স্বাস্থ্য খাতের চিকিৎসার প্রসারে সমবায়ীদের সম্পৃক্ত হতে হবে।

২. প্রতিটি গ্রামে গর্ভবতী মায়েদের সচেতনা মূলক কর্মশালা ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা– সমবায়ের নেতৃত্বে।

৩. সমিতির সভ্যদের পরিবারের মাতাও শিশু পালন সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা।

৪. সমবায় ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও বাস্তবধর্মী পদপেক্ষ গ্রহন।

৫. সমিতি গঠন করে শিশুদের কে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান দিলে শিশু মৃত্যুহার কমানো সম্ভব।

৬. শিশু ও মা-এর টিকাদান কর্মসূচিতে সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭. সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাতৃ শিশুর মৃত্যুর হার কমান সম্ভব।

৮. সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে শিশু মৃত্যু প্রসংগে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করেই শিশু জন্মের সময় মৃত্যু হার কম হয় ।

৯. উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীগণ শিশু মৃত্যুর হার কমাতে স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখতে পারে ।

১০. সমবায়ের মাধ্যমে শিশু সেবা সেল প্রতিষ্ঠা করা ।

১১. সমবায় সদস্যাদের বা গর্ভজাত মায়েদের গর্ভজনিত বিভিন্ন সমস্যা সমন্ধে শিক্ষাদানের মাধ্যমে এবং গর্ভউত্তর শিশুদের চিকিৎসা ও সেবাযত্নের মাধ্যমে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করে শিশু মুত্যুর হার কমানো যেতে পারে ।

১২. সমবায়ের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর কারণ ও প্রতিকার মূলক গণ সেমিনার সিম্পোজিয়াম করা ও চিকিৎসা দেয়া ।

১৩. সমবায়ের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ রোধ, অশিক্ষা রোধ করে গণসচেতনতা বাড়িয়ে ।

১৪. স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সহায়তায় সমবায়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে ১৫-তে নেওয়া সম্ভব ।

১৫. সমবায় সমিতিগুলোর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতন করে শিশু মৃত্যুর হার কমানো যায় ।

লক্ষ্যমাত্রা ২১ : ২০২১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে কমে হবে ১.৫ শতাংশ।

সুপারিশঃ

১. মাতৃ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা এবং সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে অংশগ্রহণ ।

২. সমবায়ের মাধ্যমে মনিটরিং করা ।

৩. সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা ।

ক) মহিলাদের বিনামূল্যে প্রতিষেধক ঔষধ ও টিকার ব্যবস্থা করা ।

খ) মহিলাদের জন্য পরিবারে সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা সে সম্পর্কে পরিবারের পুরুষদের উদ্বুদ্ধ করা ।

গ) সমাজ থেকে যাতে বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা বন্ধ করা যায় সেসম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ।

৪. সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে মৃত্যুর হার কমানো যাবে ।

৫. সমবায় ভিত্তিক মায়ের সঠিক চিকিৎসা, সেবা, খাদ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব এবং সচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে ।

৬. মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস কল্পে সমিতির সদস্যদের বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সমবায়ের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে ।

৭. মাতৃ মৃত্যু রোধে সমবায় সমিতির শিক্ষিত সচেতন মহিলাদের ধাত্রী বিদ্যায় উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে । মেয়দের উপযুক্ত বয়সের আগে যাতে বিয়ে দেয়া না হয় এ বিষয়ে সমবায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে । সমিতি কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিকে গর্ভবর্তী মা/ কিশোরীদের ভ্যাকসিনেসানের জন্য যোগাযোগ করে দিতে পারে । এছাড়াও গর্ভবর্তী মায়ের সুষম খাবার নিশ্চিতকরণে সমবায় সংগঠন সমাজে প্রচার চালাতে পারে ।

লক্ষ্যমাত্রা ২২ : ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

সুপারিশঃ

১. সমবায় এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ১টি মাত্র সন্তান থাকলে তার যাবতীয় পৃষ্ঠপোষকতা সরকার এর করা।

২. সমিতির সকল সভ্যদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

৩. মাঠ পর্যায়ে সমিতির মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৪. প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

৫. সমবায় সমিতির সদস্যদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত করতে হবে।

৬. সরকারী প্রচেষ্টায় সমবায়ের মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণে উদ্বুদ্ধ করা। এ ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। সমবায় সমিতির শিক্ষিত বেকার সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ সরবরাহ করার দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমেও সমবায় বিভাগ এ বিষয়ে ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. বাংলাদেশ সরকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো জোরদার করে এবং সমবায় ভিত্তিক আন্দোলকে সম্পৃক্তের মাধ্যমে এ প্রজনন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যবস্থা জোরদারের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সহায়ক হবে।

৮. সরকার ব্যবস্থাপনায় ও নির্দেশে সমবায় সমিতিভূক্ত মহিলাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করা।

৯. ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা এবং সমবায় সমিতিকে দায়িত্ব প্রদান।

১০. সমবায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত ছোট পরিবার গঠন, সদস্যদের বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

উপসংহার

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "রূপকল্প ২০২১" বাস্তবায়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নির্দেশিত (১৯৭২ সালে) "গণমুখী সমবায় আন্দোলন"এর বিকল্প নেই। এ আন্দোলন সফল করতে একদিকে যেমন দরকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়নসহ বর্তমান সমবায় আন্দোলন জোরদার ও বহুমুখী সম্প্রসারণ তেমনি প্রয়োজন সমবায়-চেতনা-ভিত্তিক একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত মালিকানার নীতি সংক্রান্ত 'সমবায়ী মালিকানা'-ও (সংবিধান অনুচ্ছেদ ১৩) বিষয়টি আমাদের "দেশের মাটি উত্থিত উন্নয়ন দর্শন" (home grown developoment philosophy) এর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে হবে। সুতরাং বর্তমানে প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন জাতীয় উন্নয়ন নীতি-কৌশল ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে 'গণমুখী সমবায় আন্দোলন' বিষয়টি যথাযোগ্য গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সবারই মনে রাখা জরুরি, ১৫ কোটি মানুষের আমাদের দেশে কমপক্ষে ১ কোটি মানুষই দরিদ্র-বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত। অতএব এ দেশের উন্নয়ন মানে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নয়, উন্নয়ন মানে হতে হবে বৈষম্য হ্রাস। উন্নয়নকে দেখতে হবে আন্দোলন হিসেবে। যে আন্দোলনে অন্যতম কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে পরিকল্পিত "গণমুখী সমবায় আন্দোলন"।